এ চোখে ঘুম আসে না

ফরিদ আহমেদ

কালের পরিক্রমায় আবারো প্রতি বছরের মত হাজির হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস। বিশেষ এই দিন এলেই আমাদের পত্রপত্রিকা বা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নিয়ম মাফিক বিপুল উৎসাহের সাথে উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। স্বাধীনতা দিবস যে আমাদের জন্য কত গৌরবের, আমাদের ইতিহাসের কত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বা প্রেরনার কত বিশাল উৎস স্থল ইত্যাদি ওজনদার কথায় চারিদিক সয়লাব হয়ে উঠে। রেডিও, টিভি বা সংবাদপত্রের পাতায় এই দিনের তাৎপর্য নিয়ে বিরাট বিরাট বুলি ছেড়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই একদিনের জন্য হলেও বিশাল দেশপ্রেমিক সেজে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই সবাইকে। কেউ কেউ আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করি সাড়ম্বরে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কান্নাকাটি থেকে শুরু করে, বজ্র কঠিন হাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথ গ্রহন করি এ সকল অনুষ্ঠানে। এগুলো করে ভাবি দেশ ও জাতির জন্য বিরাট কাজ করে ফেললাম। তারপর দিন ফুরিয়ে রাত আসার সাথে সাথেই সব প্রেরনা বা গৌরবগাথাকে ধামা চাপা দিয়ে আবারো গতানুগতিক দিন কাটানোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলি। যে ব্যাপক আয়োজন ও তোড়জোড় করে আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করি, সত্যিই আমরা রক্তের মধ্যে সেই চেতনাকে ধারণ করি। প্রকৃতপক্ষেই কি বিশ্বাস করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার। আসলেই কি স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের কোন চেতনা সদা সর্বত্র আমাদের শিরায় শিরায় জাগ্রত থাকে, নাকি বলতে হবে তাই তোতা পাখির মত প্রতি বছর বলে যাচ্ছি একই কথা ভাংগা রেকর্ডের মত। প্রথা মাফিক আরো পাঁচ দশটা লোক দেখানো অনুষ্ঠানের মতই স্বাধীনতা দিবসও ভান সর্বস্ব উপায়ে পার করে দিচ্ছি প্রতি বছর। প্রতিনিয়ত আমরা প্রতারনা করে যাচ্ছি নিজের সাথে, দেশের সাথে আর দেশের জনগণের সাথে। মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার মূল চেতনাকে অন্তর থেকে অনুধাবন না করেই নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি হিসাবে জারি করছি, কিন্তু চেতনাতে লালন করছি সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচন্ড অশ্রদ্ধা আর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি চরম অবজ্ঞা।

এই প্রবাস জীবনে অনেক ঘরোয়া আড্ডাতেই অংশ নিয়েছি আমি। এই সমস্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ লোককেই দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের প্রসংগ আসলেই এটিকে আওয়ামী লীগের সাথে গুলিয়ে ফেলতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা কেউ বললেই তাকে আওয়ামী পন্থী হিসাবে চিহ্নিত করতে। ভাবটা এরকম যে,

যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের যে কোন অর্জনের লাভের গুড় আওয়ামী লীগের ঘরে গিয়েই উঠবে কাজেই যত পারা যায় এর বিরোধিতা করা। মুক্তিযুদ্ধ এবং আওয়ামী লীগকে গুলিয়ে ফেলার নিদারুন ভ্রান্তিতে ভুগছে এরা। শুধুমাত্র আওয়ামী বিরোধিতা করতে গিয়ে সচেতন ভাবে এরা মুক্তিযুদ্ধকে অবমাননা করে থাকেন। দ্বিতীয় আরেক শ্রেনী আছে এর চেয়ে আরেক কাঠি সরেস। এদের মধ্যে বেশীরভাগই বিএনপি পন্থী বা প্রাক্তন মুসলিম লিগার। এরা ভুগছে এক অদ্ভুত দোটানায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, বরং রয়েছে নিদারুন অবজ্ঞা আর অবহেলা। কিন্তু রাজনৈতিক সমীকরনের কারণে জানে যে এর বিরোধিতা করলে রাজনৈতিক মঞ্চে তেমন কোন সুবিধা করা যাবে না। আওয়ামী লীগ যাতে রাজনৈতিকভাবে কোনক্রমেই মুক্তিযুদ্ধের সুবিধা না নিতে পারে তা নিশ্চিত করায় এদের মূল উদ্দেশ্য। ফলে অখ্যাত এক মেজরকে নিয়ে এসে চক্ষু লজ্জার সমস্ত পরাকাষ্ঠ তুলে যেন তেন ভাবে তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল বেদীতে সবচেয়ে উঁচু আসনে সমাহিত করাই হয়ে যায় এদের মূল কাজ। এর জন্য ড্রাম তত্ত্বের মত উদ্ভট তত্ত্ব দিতে বা নির্লজ্জের মতো এই মেজর কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষনার এক আজগুবী তত্ত্বের দিনক্ষন বছর বছর পালটে দিতে সামান্যতম বিবেকেও বাধে না এদের। আর বাধবেই বা কেন, এদের প্রাণভোমরাতো এর উপরই নির্ভরশীল। তৃতীয় আরেক ধরনের লোক দেখেছি, এরা মনে প্রাণে পুরোপুরি পাকিস্তানী। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার দুঃখে এরা এখনো গভীরভাবে কাতর। সুযোগ পেলেই পাকিস্তান আমলে কিভাবে দুধের নহর বয়ে যেতো তার ফিরিস্তী টানেন এরা। সেই সাথে বাংলাদেশ হওয়ায় কিভাবে আমরা মালাউন ইন্ডিয়ার কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছি বা নত হয়ে থাকছি তার জিকির তোলেন। পাকিস্তানের সাথে একত্রে থাকার সময় ভারত কিভাবে বিড়ালের মত মিউ মিউ করত সেই সুখ স্বপ্নের জাবর কাটেন প্রতি মূহুর্তে। মূলত ধর্মীয় সেন্টমেন্ট এবং ভারতীয় জুজুর ভয় দেখানোই এদের একমাত্র পুঁজি এবং এই দারুন কার্যকর পুঁজির যথাযথ ব্যবহারে এরা বিন্দুমাত্র কার্পন্যই করেন না। এই ত্রিমূখি অপশক্তির সামনে সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী স্বল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই কম যে অতি দুর্বল স্বরে যদি কখনোও বা তারা চেষ্টা করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদানের কথা বলতে তাহলে তাদের গলা টিপে ধরা হয় প্রবলভাবে। ত্রি শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদেরকে ভারতের দালাল বা 'র' এর এজেন্ট হিসেবে রায় দিয়ে দেওয়া হয়। সংখ্যায় খুবই কম হওয়ার কারণে ত্রিশক্তির এই অপমান নিরবে সহ্য করে যান এরা আর শাপশাপান্ত করেন মুক্তিযুদ্ধের অদুরদর্শী নেতৃত্বকে যাদের চরম ভুলের মাশুল আজ এতো বছর পরেও তাদেরকে দিতে হচ্ছে বলে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকেও এর জন্য কম মুল্য দিতে হয়নি। বিদেশি শাসকদের অপমান আর লাঞ্ছনা খাওয়া জাতিকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার অপরাধে স্বাধীনতার স্বপ্ন পুরুষকে দুধের বাচ্চাসহ পরিবারের সবাইকেই অকালেই পরপারের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিদেশি একটি টেলিভিশন শিশু রাসেলকে মারার যথার্থতা জানতে চাইলে খুনিদের হোতা কর্নেল ফারুক বলেছিল যে, রাসেলকে মার্সি কিলিং করা হয়েছে অর্থাৎ দয়া করে হত্যা করা হয়েছে। কি অপার দয়ার শরীর উনাদের। মাকে হত্যা করে মা হারা শিশু এতিম হয়ে কিভাবে দিন কাটাবে এই দুঃখে শিশুর বেঁচে থাকার কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে মৃত মায়ের কাছে পরপারে পাঠানোতেই দয়ালুদের মন কেঁদেছিল বেশি। গর্ভবতী মহিলার পেটে গুলি করে ফেলে রেখে তাকে কিছু বেশী সময় দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সময়ও করে দিয়েছিল দয়াবানরা। যে কোন পেশাদার সৈনিকই জানে পেটে গুলি করে মারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্ট দিয়ে মারা কারণ এক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধের মারা যেতে সময় লাগে সবচেয়ে বেশী। স্বপ্নপুরুষের বাকী সঙ্গী সাথীদেরও পুরষ্কারের ঘাটতি হয়নি। কাউকে জীবন দিতে হয়েছে জেলখানার মধ্যে, কাউকে বা রাস্তা ঘাটে, মাঠে ময়দানে। আবার কাউকে কাউকে বিচারের নামে প্রহসনমুলক কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবপারে। বাকিদেরকে কিঞ্চিত ভয় প্রদর্শন বা হাড্ডি মাংসের লোভ দেখিয়ে টেনে নেওয়া হয়েছে নিজেদের দলে। তারপর ফাঁকা মাঠে চালানো হয়েছে শুদ্ধি অভিযান।

নারী ও শিশু হত্যাকারী এই সমস্ত বীর পুঙ্গবদের রক্ষা করতে উদার হাতে এগিয়ে এসেছিল রাষ্ট্র তার সকল শঠতা এবং কুটিলতা নিয়ে। কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না যে, খুনিদের রক্ষা করার জন্য জাতীয় সংবিধানে ইনডেমনিটি সংযোজন করা হয়। কিন্তু সব সম্ভবের এই দেশে খুনীদের বিচার থেকে শুধু রক্ষাই করা হয়নি বরং তাদেরকে বীরত্বের পুরষ্কার হিসাবে রাষ্ট্রীয় নানা গুরুত্বপুর্ন পদেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল অতি সম্মানের সাথে।

পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই মুলতঃ শুরু হয় একাত্তরের হায়েনাদের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের অভিযান, বাংলাদেশকে আরেকটি পাকিস্তানে পরিনত করার সূদুর প্রসারী কর্মকান্ড। পরিকল্পিত ভাবে একে একে ধ্বংস করা হতে থাকে আমাদের সব গর্ব এবং অহঙ্কারের জায়গাগুলো। দেশের গৌরবময় ইতিহাসকে অতি নির্মমভাবে মুছে দিয়ে বিকৃত এক ইতিহাস দিয়ে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার সব আয়োজনই বর্তমানে সমাপ্ত প্রায়। ভাইরাল ডিজিজে ভাইরাস যেমন কোন কোষকে দখল করার জন্য তার ডি এন এর কিছু অংশকে পাঠায় নিউক্লিয়াসে, তেমনি পাকিস্তানপন্থি কিছু কুলাঙ্গার তাদের কুটিল আচরনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৌলিক কাঠামোকে বেদখল করে পাকিস্তানী মডেলে ঢেলে সাজিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যেই। আর এর জন্যই দেখি নিজস্ব ইতিহাস বা সংস্কৃতির গর্বিত উত্তরাধিকার বাদ দিয়ে জগাখিচুরী এক মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের নতুন প্রজন্ম ।

যারা আটানব্বই সালে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইন্ডিপেনডেনস কাপ ক্রিকেটের ভারত বনাম পাকিস্তানের ফাইনাল খেলা টিভিতে অথবা মাঠে গিয়ে দেখেছেন তাদের হয়ত পরিষ্কার স্মরণে আছে, কি বিপুল উৎসাহ আর উদ্দিপনা নিয়ে আমাদের দর্শকরা পাকিস্তান টিমকে সাপোর্ট দিয়েছিলো। অনেকেই বলবেন খেলার মাঠে যে কোন দলকে সাপোর্ট দেওয়ার মধ্যে দোষের কি আছে। খেলার সাথে রাজনীতিকে টেনে আনার ঘোরতর বিরোধী অনেকেই। এটা আমিও স্বীকার করছি যে এর মধ্যে দোষের তেমন কিছুই নেই। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, মাঠ ভর্তি প্রায় সব দর্শকই পাকিস্তানের জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, গালে, কপালে, বুকে বা বাহুতে পাকিস্তানের পতাকা একেছে, মাথায় পাকিস্তানের পতাকা বাধা, কারো বা পরনের পোষাক পাকিস্তানী পতাকার আদলে করা এবং সেই সাথে হাতে বিশাল বিশাল পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধবনিতে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ফেলছে, তখনও কি সেই খেলা রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার বাইরে থাকতে পারে, নাকি রাখা সম্ভব। এই খেলা উপভোগ করার জন্য পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফও আমন্ত্রিত হয়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে আমাদের এই উদারতা এবং পাকিস্তানের প্রতি আমাদের উন্মত্ত প্রেম খুব ভালভাবেই উপভোগ করছিলেন তা তার উজ্জ্বল হাসিমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এই খেলাটি সরাসরি পাকিস্তানেও সম্প্রচার হয়েছিলো। কাজেই পুরো পাকিস্তানের জনগণই যে তাদের এক সময়কার উপনিবেশের লোকজন, যাদেরকে তারা অতি ঘৃনা এবং অবহেলার সাথে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হিসাবে গন্য করতো, এখনো পাকিস্তানের প্রতি তাদের এতো সুগভীর ভালবাসা দেখে গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছিল সে বিষয়ে ও কোন সন্দেহ নাই। একাত্তর সালের আগে এই মাঠে এক সময় নিয়মিত খেলতো জুয়েল নামের অসাধারণ মেধাবী এক ক্রিকেটার। বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যান হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার দুচোখ জুড়ে। সেটা হওয়ার যোগ্যতাও যে তার ছিলো সে বিষয়ে অনেক লোকেরই কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একাত্তুর সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে কি এক দুর্বুদ্ধিতে ক্রিকেট ছেড়ে যুদ্ধে গেল জুয়েল । তারপর আর জীবিত ফিরে আসা হয়নি তার। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের প্রতি জনগণের বিপুল এই সমর্থন দেখে জুয়েলের আত্মা যে যুদ্ধে যেয়ে জীবন দিয়ে কত বড় নির্বোধের কাজ হয়েছে সেটা নিয়ে আফসোস করেছে এটা বলাই বাহুল্য।

আমাদের পাকিস্তান প্রীতির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আর একটু এগিয়ে গেলে দেখবো, জুয়েলের মতো আরো এক নির্বোধ রুমির (যে কিনা আমেরিকায় পড়াশোনা করতে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে, মায়ের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরা পড়ে চরম অত্যাচারিত হয়ে মারা গিয়েছিলো) ক্যান্সারে আক্রান্ত নিশ্চিত মৃত্যু পথযাত্রী ব্যথাতুরা মা বিরানব্বই সালের ছাব্বিশে মার্চ রাজাকার আলবদরদের বিচারের জন্য গণ আদালত গঠনেরর প্রস্তুতি নেন। পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যার পরপরই নিউজিল্যান্ডে বিশ্বকাপ জিতে নেয় পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। তাদের এই জয়কে আমরা আমাদের নিজেদের বিজয় হিসাবে ধরে নিয়ে ঢাকার রাজপথ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধবনি দিয়ে আনন্দ উল্লাসে আর রং ছড়াছুড়িতে মাতিয়ে দিয়েছি। সবচেয়ে উৎসবমুখর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। একাত্তরে রাজাকার আর আলবদরদের হাতে মারা যাওয়া শহিদ বুদ্ধিজীবি পরিবারগুলো বেশীরভাগই অইখানেই থাকেন । তারা যে কানে বালিশ চাপা দিয়ে সারারাত কেঁদেছেন, কেউ কেউ আবার এই আনন্দ উল্লাস সহ্য করতে না পেরে লজ্জায় অপমানে আত্মহত্যার মত কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ারও চেষ্টা করেছেন, সেগুলো আমরা পরবর্তীতে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। কিন্তু এতে করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আনন্দ উল্লাসে কোন ঢিল পড়ে নি। পড়বেই বা কেনো, কোন কালে সাচ্চা মুসলমান পাকিস্তান আর্মি একটু গোস্বা হয়ে কয়েক লাখ মানুষ মেরে ফেলেছিল সেই অতীত ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে নাকি। বর্তমান আর ভবিষ্যতই হচ্ছে আসল, অতীত নিয়ে টানা হেচড়া করে নির্বোধেরা।

যারা দেশের বাইরে আছেন, তাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে পাকিস্তানীদের সাথে সামাজিকভাবে মিশতে হয়, বন্ধুত্ব করতে হয়। এতে দোষনীয় কিছু নেই। সব পাকিস্তানীই যে একাত্তরের পাকিস্তান আর্মির মতো হিংস্র এবং খারাপ তা কিন্তু নয়। আমার অনেক পাকিস্তানী বন্ধুই আমার কাছে একাত্তুরের গণহত্যা এবং তারো আগে বাঙ্গালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চেয়েছে। তবে এর উলটো আচরনও পেয়েছি অনেক সময়। ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমার এক পাকিস্তানী বন্ধু আমার জন্য অন্য এক পাকিস্তানীর কাছ থেকে একটি পাঠ্যবই আনতে চেয়েছিল। শুধুমাত্র আমি বাঙ্গালী হওয়ার কারণে সে আমাকে বইটি দিতে রাজী হয়নি, এবং এটি জানিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করেনি সে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে অধিকাংশ পাকিস্তানীই আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন শুনলেই কোন রকম ভুমিকা ছাড়াই নির্দ্বিধায় উর্দুতে কথা বলা শুরু করে দেয়। বেশীরভাগ পাকিস্তানীরই ধারণা বাংলাদেশের সব মানুষই উর্দু জানে এবং আমাদেরকে উর্দু শেখানো হয়। বাংলাদেশের মানুষ যে উর্দু না জানতে পারে এটা তাদের মাথায়ই আসে না। আমি উর্দু জানি না শুনে প্রায় সব সময়ই পাকিস্তানীরা ভীষন অবাক হয়। কেউ বিশ্বাস করে কেউ বা করে না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন ওরা যদি অজ্ঞ হয় আমরা তার কি করতে পারি। হ্যা আসলেই আমাদের করার কিছু নেই। কিন্তু এটা কি আমরা ভেবে দেখেছি যে এর জন্যও কিন্তু মূলতঃ আমরাই দায়ী। আমাদের উর্দুতে কথা বলার অতি উৎসাহের কারণেই তাদের মধ্যে এই ধারণার জন্ম নিয়েছে। কোন পাকিস্তানীকে দেখলেই আমাদের বেশিরভাগ বাঙ্গালীরই উর্দুতে বাতচিৎ করার জন্য মন আকুলি বিকুলি করতে থাকে। ঠিকমত পারি বা না পারি উর্দুতে কথা বলে একধরনের বিচিত্র গর্ব অনুভব করি আমরা। এক বাংলাদেশী ভদ্রলোককে উর্দু যে কত উন্নত ভাষা, উর্দুতে যে মনের ভাব কত ভালো ভাবে প্রকাশ করা যায় তা খুব ভাবে গদগদ হয়ে বলতে শুনেছিলাম একবার।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশে যা ঘটছে সে তুলনায় এগুলো কিছুই না। জামাতের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় আসার পর মহা কৃতজ্ঞ বিএনপি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একাত্তরে পাকিস্তান আর্মির দোসর দুই যুদ্ধাপরাধীকে অতি সম্মানের সাথে মন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। আর মন্ত্রীত্ব পেয়েই একাত্তরের আলবদর বাহিনীর প্রধান নিজামী তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আবারো লেলিয়ে দিয়েছে তার গুপ্তঘাতক

বাহিনী। এরই পরিনতিতে আমরা দেখেছি হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা, হিন্দুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন, শায়খ আবদুর রহমান বা বাংলা ভাইয়ের উত্থান এবং সারা দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য জেএমবির সুইসাইডাল স্কোয়াডের হামলা। আজ প্রায় পয়ত্রিশ বছর পর এসে আমাদের নিশ্চয় উপলব্ধি হওয়ারই কথা যে এই বাংলাদেশ আমরা চাই নি। আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ ছিনতাই হয়ে চলে গেছে তাদের হাতে যারা একদিন তাদের সর্ব শক্তি দিয়ে, চরম নৃশংসতা দিয়ে বাধা দিতে চেয়েছিল এর জন্মকে। আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় নিজামী যে মন্ত্রলায়ের মন্ত্রী সেখানে নিশ্চই আনেক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্মরত আছেন। নিজামীর সামনে এখন যখন তাদের কাঁচুমাচু হয়ে দাড়িয়ে থাকতে হয় বা নিজামীর ধমক খেতে হয় তখন তাদের মনের অবস্থা কেমন হয়। যার থাকার কথা ছিল জেলে বা কথা ছিল ফাঁসী হওয়ার, সেই নিজামী এখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা লাগানো গাড়ীতে চড়ে ঘোরা ফেরা করে, উঠতে বসতে ধমক লাগায় মুক্তিযোদ্ধাদের। এই দুঃখ রাখবো কোথায়।

অকাল প্রয়াত প্রতিভাবান কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এগুলো দেখেই তার হতাশা আর যন্ত্রণার কথা লিখেছিলেন ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ কবিতায়। একাত্তরের দুঃসহ সমৃতির যন্ত্রণায় কাতর কবি তার সারা রাত ঘুমুতে না পারার কথা আমাদের জানিয়ে গেছেন এখন থেকে অনেক আগেই। রুদ্রর মতো বাংলাদেশে এখনো অনেক লোক আছেন যারা দুর্বিসহ এই অপমান আর যন্ত্রণায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেন প্রতিদিন।

ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে আমার এই লেখাটি শেষ করছি। যারা আনিসুল হকের সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘মা’ পড়েছেন, তারা জানেন সেখানে লেখক শহীদ এক মুক্তিযোদ্ধা আজাদের মায়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। রাতের খাওয়া শেষ করার আগেই পাকিস্তান আর্মি আজাদকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে পরবর্তী চৌদ্দ বছর এই মা যত দিন জীবিত ছিলেন আর কখনোই ভাত খেতে পারেননি। মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছেন তার সারা জীবন এই ভেবে যে তার প্রাণ প্রিয় সন্তানকে হয়তো হাজতের ঠান্ডা মেঝেতে ঘুমোতে হয়েছে সারারাত।

একাত্তরের লক্ষ লক্ষ শহীদ, যারা তাদের সোনালী বর্তমানকে বিসর্জন দিয়েছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, তাদের প্রতি কি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাই না প্রকাশ করছে এই বাংলাদেশ। ক্ষোভে দুঃখে মাঝে মাঝে মরে যেতেই ইচ্ছে করে। কে জানে, আমার মতো হয়তো আরো অনেকেরই এ ধরনের অনুভূতি হয়।

উইন্ডজর, ক্যানাডা
farid300@gmail.com